ঠাকুরবাড়ির আড্ডা

শুভঙ্কর রায়চৌধুরী

পুনশ্চ

আড্ডা! এই শব্দটা সকলের কাছেই খুব প্রিয় শব্দ। বিশেষত বাঙালি জাতির কাছে। বাঙালিয়ানার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য আড্ডা মারা। তিনজন বাঙালি একসঙ্গে জড়ো হলেই রত হয়ে যায় খোশগল্প, রসালাপে। প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সমস্ত কাজকে হেলায় বাতিল করে বাঙালি মজে যায় আড্ডায়। সমমনস্ক মানুষের মধ্যেই আড্ডা জমে ওঠে।

আড্ডা শব্দটি হিব্রু শব্দ। বৈঠক, মজলিশ আড্ডার সমধর্মী। আড্ডার ধারনাটি অতি পুরাতন। বাংলাদেশে জমিদারী প্রথা উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই সমমনস্ক মানুষ বা পাড়ার মোড়লদের গল্প-গুজব, শলা-পরামর্শ এবং অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক বিচারের জন্যও এই সকল আড্ডা বা মজলিশের সূচনা হয়। আড্ডায় অনেক সময় থাকে না কোন নির্দিষ্ট বিষয়। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে এগিয়ে চলে আড্ডা।

ঠাকুরবাড়ির আড্ডা! সেটি তো একটু ব্যতিক্রমী হবেই। যে বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং জীবনের অনেকটা সময় কাটানো, সেখানকার আড্ডা তো অবশ্যই আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করবেই। এই শহরে ঠাকুর পরিবার ছিল একটি অন্যতম অভিজাত

পরিবার। কলকাতা শহরের বুকে সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল এই ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাড়ির আড্ডা প্রধানত ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে। ঠাকুরবাড়ির বাহির মহলের আড্ডাতে ঠাকুরবাড়ির পরিজন ভিন্ন বাইরের অনেক বিদগ্ধ জনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

এ প্রসঙ্গে সে সময় ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের অবস্থা সংক্ষেপে একটু ফিরে দেখা যাক। ঠাকুরবাড়ির মহিলারা ছিলেন পর্দানশিন। জোড়াসাঁকোর পাঁচ নম্বর এবং ছয় নম্বর বাড়ির মধ্যে দূরত্ব একেবারে সামান্য হলেও যাতায়াতের জন্য মেয়েদের পালকি ব্যবহার করতে হত। গঙ্গাস্নানে গেলে পালকি বাহকেরা পালকিশুদ্ধ জলে চুবিয়ে আনত।

নবজাগরণের হাওয়া ঠাকুরবাড়ির মহিলাদেরও আন্দোলিত করেছিল। এ বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর পুত্রদের উৎসাহ এবং উদ্যোগ কম ছিল না। হেমেন্দ্রনাথ বাড়ির মেয়ে-বৌদের নিয়ম করে লেখাপড়া শেখাতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শোনাতেন দেশ বিদেশের গল্প। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে কয়েকজন সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচয় রেখেছিলেন। নবজাগরণে তাঁদের ভূমিকাও কম নয়। ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের এই নবজাগরণে পৃথকভাবে অবশ্যই নাম উল্লেখের দাবি রাখে সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। সে সময় ঠাকুরবাড়ি শিক্ষা সংস্কৃতি কেবল নয়, মুক্ত চিন্তা-চেতনার ধারা বহন করে চলা একটি পরিবার।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মহিলারাও যে আড্ডায় পারংগম ছিলেন, সে বিষয়টি সরলা দেবী চৌধুরাণীর 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থের লেখায় ধরা পড়ে : ''সিমলে বাড়িতে বাড়ির ভিতরের দিকের সিঁড়ি উঠেই

মায়ের শোবার ঘর। ঘরে এক প্রকাণ্ড পালঙ্ক। সেই পালঙ্কের উপর যোড়াসাঁকো থেকে সমাগত মাসি, মামী ও দিদিদের প্রায় নিত্যই মধ্যাহ্ন থেকে গড়ান পার্টি জমত। তাসখেলার অবসরে কাঁচা সরষের তেল মাখা টাটকা মুড়ি, ফুলুরি, ও বেগুনির রসাস্বাদন, বর্ষা হলে সাঁতলাভাজি— এই ছিল পার্টির মূল প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামে কোন কোনদিন একটু বৈচিত্র্য ঢোকানো হত গানে বা মায়ের রচিত কবিতা আবৃত্তিতে।"

রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'য় উল্লেখ পাই, ''মনে পড়ে বাড়ি-ভিতরের পাঁচিল ঘেরা ছাদ। মা বসেছেন সন্ধেবেলায় মাদুর পেতে, তাঁর সঙ্গিনীরা চারদিকে ঘিরে বসে গল্প করছে। সেই গল্পে খাঁটি খবরের দরকার ছিল না। দরকার কেবল সময় কাটানো।"

জোড়াসাঁকোর বাড়ির তেতলার ছাদে কাদম্বরী দেবীর নন্দন-কাননের গল্প অতি সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' থেকে উদ্ধৃত করলাম।

''দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রূপোর রেকাবিতে বেলফুলের গোড়েমালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক গ্লাস বরফ দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচিপান।

বউঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। ... ছাদটাকে বউঠান একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন। ... প্রায় আসতেন অক্ষয় চৌধুরী।... হাতের কাছে আওয়াজওয়ালা কিছু পেলেই দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে পটাপট শব্দে তাকেই বাঁয়া-তবলার বদলি করে নিতেন। মলাট-বাঁধানো বই থাকলে ভালোই চলত।"